Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 219–223
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

প্রসঙ্গ : বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

ড. অমলচন্দ্র সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শান্তিপুর কলেজ, শান্তিপুর, নদীয়া
ইমেল : chandraamal71@gmail.com

Keyword
উৎকর্ষতা, কল্পনারঞ্জিত, স্বদেশপ্রেম, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, গার্হস্থ্য, অবজ্ঞা সমস্যামূলক, যুগসন্ধিক্ষণ।

Abstract
উপন্যাসের মধ্যে পুরাতন ও সমকালীনতার আদর্শ এক সঙ্গে বিরাজ করে। উপন্যাস সাহিত্যে উচ্চতর আদর্শের এই অতর্কিত প্রয়োগ ও পরিবর্তনের গভীরতার প্রকৃত রূপটি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে উপন্যাস যে উৎকর্ষতা লাভ করেছিল তা ছিল নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করার একান্ত প্রচেষ্টার ফসল। তাই বলা যায় প্রথম সার্থক প্রবর্তকের যে সার্থক গৌরব তা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাপ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল ও মিশ্র ধরণের। তাই ইতিহাস বহুক্ষেত্রেই কল্পনারঞ্জিত ও রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাঁর আদর্শবাদ জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি উপাদানগুলি অনুরঞ্জিত উপন্যাসগুলি মহাকাব্যের বিশালতা লাভ করেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে যে কঠোর দায়িত্ব তা কিন্তু সর্বত্র মানা হয়নি। স্বদেশপ্রেমমূলক উপন্যাসে জ্বলন্ত বিশ্বাস সঞ্চার করে জ্ঞান-গৌরবমন্ডিত আদর্শের আকার দান করেছেন। আবার তারই মধ্যে তিনি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক বিপ্লবের গৌরব আরোপ করেছেন। তার ফলে অতীত ইতিহাসের চিত্রপটের উপর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উজ্জ্বল দিকটি বিন্যস্ত হয়েছে। প্রেমিক যেমন সমগ্র বাস্তব জগৎকে নিজ আদর্শ স্বপ্নের সাদৃশ্যে রূপদান করে তেমনি স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রও অতীত ইতিহাসকে দেশভক্তির প্রবল অগ্নিতে গলিয়ে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তার উপর নিজের রাজোচিত মনের প্রভাব মুদ্রিত করে দিয়েছেন। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্র সার্থকতা লাভ করেছে। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস নব আবিস্কার। চরিত্রের ব্যক্তিস্বরূপে, বাস্তবতায় এবং বিশ্লেষণধর্মে পুরাতন কাহিনী থেকে উপন্যাস একেবারেই পৃথক। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে উপন্যাস লেখা আরম্ভ হলেও বঙ্কিমেই উপন্যাসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটেছিল, কিন্তু বঙ্কিম প্রতিভায় অতীতের নিকট ঋণ গ্রহণের চেষ্টা বিন্দুমাত্র নেই, বরং ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করার শক্তি আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ধারাকে পুষ্ট করে উত্তরাধিকারের হাতে দান করে গেলেন। গোটা ঊনবিংশ শতক ধরে এই ধারার অনুবর্তন চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র নির্মিত উপন্যাসের গঠন কৌশল এ শতাব্দীর প্রায় সব লেখককেই অনুসরণ করতে হয়েছে। বঙ্কিম প্রবর্তিত ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায় পরবর্তীকালে বহু ঔপন্যাসিক আত্মনিয়োগ করেছেন। রোমান্স কল্পনার অংশটুকু বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ইতিহাস কাহিনী রচনার যে চেষ্টা চালিয়েছিল কোন কোন ঔপন্যাসিকগণ, তাতে কিছুটা সাফল্য পেলেও, পুরোপুরি সাফল্যের জায়গায় পৌঁছাতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনায় আমরা তা খুব ভালোভাবেই

অনুধাবন করতে পারি।

Discussion

"উপন্যাস জীবনের পূর্ণতাকে আঁকার চেষ্টা করে থাকে, তাই যে ঔপন্যাসিক যতবেশী বাস্তব জীবন বা সেই জীবন-কল্প চিত্র উপস্থিত করতে সচেষ্ট তিনি শিল্পী হিসেবে ততবেশী আদৃত হন।"[১]

'দুর্গেশনন্দিনী'র ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই ঐতিহাসিক পটভূমিকার সাহায্যে উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীকে অতীত যুগে টেনে নিয়ে গেছেন। রাজসিংহের পটভূমিকাই শুধু ঐতিহাসিক নয়, এর মূলকাহিনী, ঔরঙ্গজেব, চঞ্চলকুমারী, রাজসিংহ চরিত্র ইতিহাস থেকে গৃহীত। এই কারণেই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র রাজসিংহকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার করেছিলেন।

"ঐতিহাসিক কল্পনা বা historical imagination বঙ্কিমের ছিল..."[২]

ঐতিহাসিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক কাল ও প্রতিবেশে ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যক্তিগত অনুভূতির কাহিনী। এর জন্য দুটি বিষয়ের অবতারণা করা হয় যেমন, একটি হল ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ইতিহাসের অন্তর্নিহিত গূঢ় সত্য সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা এবং তার প্রতি প্রাণের টান। দ্বিতীয়টি হল, ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও উপলব্ধি। এই নিয়মানুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সব উপন্যাসে ইতিহাসের সংস্পর্শ রয়েছে তার মধ্যে কপালকুন্ডলা এবং দেবী চৌধুরাণী' ভিন্ন আর সব উপন্যাসকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়। 'কপালকুন্ডলার' মেহেরউন্নিসা ঐতিহাসিক চরিত্র এবং দু'একটি রেখায় এঁদের যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তা উপন্যাস বর্ণিত রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার চিত্র ইতিহাস-সম্মত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কপালকুন্ডলা'য় যুগোপযোগী পরিবেশ নেই এবং অধিকাংশ ঘটনা সপ্তগ্রামে ঘটলেও এতে সপ্তগ্রামের তৎকালীন পৌরজীবনের কোন চিত্র নেই। আবার দেখা যায়, দেবী চৌধুরানী'তে যুগোপযোগী পরিবেশ বিদ্যমান। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক চরিত্র বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা নেই। দেবী চৌধুরানী ও ভবানী পাঠক আসলে এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় সৃষ্টি। আবার কোন কোন পন্ডিতের মতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাক বা না থাক, ঐতিহাসিক পরিবেশ থাকলেই উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়। এই সব পন্ডিতদের মতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ যুগোপযোগী পরিবেশ, চরিত্রসৃষ্টি সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও কোন অসুবিধা নেই। এই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে দেবীচৌধুরানী উপন্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সামাজিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস ইত্যাদি বাঁধাধরা শ্রেণীবিভাগ অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে, কারণ অনেক সময় একই উপন্যাসে বিভিন্ন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'দেবী চৌধুরানী'র উল্লেখ করা যায়। ব্যাপক সংজ্ঞা অনুসারে এটা ঐতিহাসিক উপন্যাস, অথচ এতে নিখুঁত গার্হস্থ্য জীবন ও সমাজ জীবনের চিত্র রয়েছে। আমরা দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্রের সবগুলি উপন্যাসই কমবেশী রোমান্সগন্ধী। বিষয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর উপন্যাসগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঐতিহাসিক, সামাজিক, রোমান্টিক, সমস্যামূলক ও তত্ত্বমূল্ক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস এর মধ্যে ধরা হয়েছে, 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'মৃণালিনী'(১৮৬৯), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) ও 'রাজুসিংহ' (১৮৮২)। সামাজিক উপন্যাস হল— 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) , 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)। রোমান্টিক উপন্যাস হল—'রাধারানী' (১৮৮৬), 'যুগলাঙ্গরীয়' (১৮৭৪)। সমস্যামূলক উপন্যাস হল—'কপালকলা' (১৮৬৬), তত্ত্বমূলক উপন্যাস—'আনন্দমঠ' (১৮৮৪)। , 'দেবীচৌধুরানী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক বা গার্হস্থ্য উপন্যাসে ভালোমন্দোয় মিশানো তৎকালীন সমাজ জীবনের চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু এই চিত্র প্রধানত অভিজাত সম্প্রদায়ের চিত্র। যেখানে সাধারণ মানুষ এসেছে পরিপূরক হিসেবে; বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে যুগের মানুষ, সে যুগ অভিজাত সম্প্রদায়ের যুগ বলা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র, মানিক, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ ছিল নিবিড়। বঙ্কিমচন্দ্র সহানুভূতিশীল হলেও সাধারণ মানুষকে দেখেছেন দূর থেকে, তিনি তাদেরকে চিনেছেন বুদ্ধির সাহায্যে, নিকট থেকে তাদের জীবনের স্পন্দন অনুভব করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একাধিক প্রবন্ধে যে যুগের সামাজিক সমস্যার আলোচনা করেছেন এবং তাঁর উপন্যাসেও এই সকল সমস্যার উল্লেখ বা আভাস রয়েছে। এই সব সমস্যার মধ্যে বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের পরিচালনায় 'বিধবা-বিবাহ' আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বিধবা-বিবাহের প্রশ্ন তুলেছিলেন, শুধু তাই নয়, বিষবৃক্ষে' তিনি বিধবা কুন্দের বিয়ে দিয়েছেন। কুন্দের এই বিয়ে সুখের হয়নি সত্যি, কিন্তু তাঁর করুণ পরিণতির পিছনে রয়েছে আর্টের দাবীর প্রশ্ন, ইহা কিন্তু বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিম মতবাদের পরিচয় দেয় না। বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল উপন্যাসে বিধবা-বিবাহের প্রশ্ন তুলেছেন, সেই সকল উপন্যাসে আখ্যায়িকার, পরিবেশন প্রণালী থেকে মনে হয়, তিনি বলেতে চেয়েছেন যে, শাস্ত্র বা বিচারবুদ্ধি যাই বলুক; হিন্দুর সংস্কার কখনও বিধবা-বিবাহকে সমাজে চালু হতে দিতে পারে না। 'মৃণালিনী'র পটভূমিকা সুদূর অতীতের হলেও এই উপন্যাসেই প্রথম বিধবা-বিবাহের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। পশুপতি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেন, তিনি বল্লাল সেনের মত নতুন সমাজবিধান প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু তা ব্যক্তিগত তাগিদে। তিনি বিধবা-বিবাহের ভালোমন্দ ঔচিত্যানৌচিত্যের বিচার করেননি। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি কতকটা একই রকমের। কুন্দ না থাকলে এ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনরূপ প্রশ্ন জাগত না, অথবা বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তিতর্কের দ্বারা ইহা প্রমাণ করবার কোন প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করতেন না। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' হরলালের যুক্তিতর্কের কোন বালাই নেই; তার দৃষ্টি স্বচ্ছ। হরলাল প্রথমে প্রাচীনপন্থী পিতাকে বিধবা-বিবাহের হুমকি দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চেয়েছেন, পরে নিরাশ হয়ে শেষ উপায় হিসেবে রোহিনীকে হাতের মুঠোই আনবার জন্য তাকে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু কোন সময়েই যে সত্যসত্যই বিধবা বিবাহের কল্পনা করে নাই। গোবিন্দলাল গণনার বাইরে, কারণ তিনি বিধবা রোহিনীকে নিয়ে সমাজ ত্যাগ করেছেন, রোহিনীকে বিয়ে করে তার সঙ্গে সম্পর্ক বৈধ করতে চেষ্টা করেননি। তাই দেখা যাচ্ছে যে, পশুপতি থেকে আরম্ভ করে হরলাল পর্যন্ত যারাই বিধবা-বিবাহের কথা তুলেছেন, তারাই কমবেশী আত্মসুখ ও আত্মস্বার্থ খুঁজেছেন কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো বিধবার দুঃখ তাঁকে মর্মস্পর্শ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত বলতে চান, হিন্দুসমাজে যাঁরা বিধবা-বিবাহের জন্য আন্দোলন করেন বা আন্দোলনকারীকে সমর্থন করেন তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ কেহ বা পশুপতি নগেন্দ্রনাথের, কেহ বা হরলালের, কেহ বা তারাচরণের সমগোত্রীয়। আর যাদেরকে উপলক্ষ্য করে এই প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা, তাঁরাও বড় কেহ একে অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করতে পারেননি। রোহিনীর মত কোন বাল-বিধবা হয়ত এই আন্দোলনের কথা শুনে ক্ষণিকের জন্য উন্মনা হতে পারে, কুন্দের মতো কেহ হয়ত নবন্মোচিত প্রণয়ের আবেগে ভালমন্দ বিচার না করে বা বিচার করতে না পেরে পুনরায় বিয়ে করতে পারে, কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুনারীর অভিমত প্রকৃতপক্ষে ব্যক্ত হয়েছে সূর্যমুখীর মুখে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গোক্তি বাদ দিলে সূর্যমুখী যা বলেছেন তাই হিন্দু নারীর মর্মকথা এবং পাত্রপাত্রীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে প্রশ্নটির বিচার করেছেন তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শুধু যুক্তির দিক দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে বিধবাকে বিয়ের অধিকারিনী বলে স্বীকার করলেও তার মন তাতে সায় দেয় না।

একদা দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতানৈক্য ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেখানে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়, বঙ্কিম সেখানে মনে করেন শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া হয়েছে। বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় তিনি মনে করেন, শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া বিপজ্জনক, কারণ বহুবিবাহ যেমন সাধারণভাবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তেমনি শাস্ত্রেই আবার এমন অনেক অবস্থার উল্লেখ রয়েছে, যার অন্যায় সুযোগ নিয়ে শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘন না করেও বহুবিবাহ সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বহু-বিবাহের যে সকল চিত্র এঁকেছেন জনমত গঠনে তা কতখানি সহায়ক। রজনী'তে রামসদয় মিত্রের বহু-বিবাহ তাঁর পরিবারে কোনরূপ অশান্তির সৃষ্টি করেনি। দেবী চৌধুরানী'তে দেবীর নতুন বৌ রূপে ব্রজেশ্বরের সংসারে আসার পরের কথা ছেড়ে পূর্বের কথা আলোচনা করলে দেখা যায় এই রকম—নয়ানবৌ কুরূপা ও ঝগড়াটে, কিন্তু একে সাগরবৌ প্রায়ই শ্বশুরবাড়ী আসত না, তাতে সে সদা-হাস্যময়ী। দু-একটি খোঁচা দিয়ে নয়ানবৌকে রাগিয়ে তুলে তাকে নিয়ে রঙ্গ করা ভিন্ন সে কখনও সতীনের সঙ্গে সত্যকার কলহ করে ব্রজেশ্বরকে বিব্রত করেনি। সীতারামে' দেখা যায়, কারণ যাই হউক, নন্দা কখনও রমাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করেনি, পরন্তু জ্যৈষ্ঠার স্নেহ দিয়ে তাকে আগলে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সীতারামের অনাদরের রমা মারা গেছে সত্য, কিন্তু এর কারণ সন্ন্যাসিনী শ্রীর প্রতি সীতারামের অনুচিত মোহে। শ্রী যদি গৃহিনীরূপে সীতারামের সংসারে তাঁর ন্যায় আসন গ্রহণ করতে পারত তাহলে এরূপ অনর্থ হয়ত নাও ঘটতে পারত। 'বিষবৃক্ষে' এ সম্বন্ধে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়, এই উপন্যাসে নগেন্দ্র-কুন্দের

বিয়ে সুর্যমুখীর জীবনে, নগেন্দ্রের সংসারে দারুণ বিপর্যয় এনেছে। একথাও সত্য যে, সূর্যমুখীর জীবনে স্বামীর দ্বিতীয়বারের বিয়ের সাময়িক প্রতিক্রিয়া যাই থাক না কেন, বেঁচে থাকলে কুন্দ তার নিকট থেকে ভগিনীর স্নেহলাভে বঞ্চিত হত না। এই সকল চিত্র নিশ্চয়ই বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে জনমতগঠনের সহায়ক নহে।

'রজনীতে' বহুবিবাহের যে চিত্র পাই তা এই রকম-বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের পাশে রয়েছে তার তরুনী ভার্যা লবঙ্গলতা। কিন্তু লবঙ্গলতার মনের নিভৃত কোনে অমরনাথের সম্বন্ধ যে দুর্বলতাই থাক, বৃদ্ধ স্বামী এবং সপত্নীপুত্র শচীন্দ্রকে নিয়ে তার দিনগুলি সুখে কেটেছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহের মত বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার চিত্রেও এই কুপ্রথার কুৎসিত দিক এড়িয়ে গিয়েছেন। সবদিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, সমসাময়িক কোন সামাজিক সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত করেনি। তাঁর সমস্যামূলক উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা'য় যে সমস্যার অবতারণ করেছেন তাও এই ধারণার পরিপোষক বলে মনে হয়েছে।

"মৃণালিনীর প্রকৃত ত্রুটি হইতেছে ইহার ঐতিহাসিক আবেষ্টনে ও ইতিহাসের সহিত প্রেমকাহিনীর সামঞ্জস্য স্থাপনে।"[৩]

'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় চরিত্রে দুর্বলতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই উপন্যাসেই পশুপতি ও শান্তশীলের পাশে তিনি সৃষ্টি করেছেন মাধবাচার্যকে। তিনি চরিত্রটিকে যথাযথ রূপ দিতে না পারলেও, উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার যাদুকাঠির স্পর্শে এই মাধবাচার্যই পুনর্জীবন লাভ করে সত্যানন্দরূপে সন্তানসেনার অধিনায়ক হয়েছেন।

"কপালকুণ্ডলার রোমান্টিক আবেষ্টন রচনায় বঙ্কিম অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।"[৪]

'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমপ্রতিভা শৈশব অতিক্রম করে পরিপূর্ণ যৌবনে এসে পৌঁছেছে। কপালকুন্ডলা'র কাহিনীতে কোথাও কোন জড়তা বা অনাবশ্যক জটিলতা নাই, অথবা কোন অনাবশ্যক চরিত্রও নাই, চরিত্রাঙ্কনে, আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশে সর্বত্রই সূক্ষ্ম পরিমাণবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনী'র ন্যায় আলোচ্য উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র তার কল্পিত আখ্যায়িকাকে ভারতের অতীতের এক বিশিষ্ট অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত করেছেন। এই উপন্যাসে ইতিহাসের স্থান নিতান্ত গৌণ, একমাত্র মতিবিধির চরিত্রের ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে তার যা কিছু সার্থকতা। প্রকৃতপক্ষে দুর্গেশনন্দিনী'র ন্যায় ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস রচনা, এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য নয়। কপালকুন্ডলা' কল্পনারাজ্যে ঔপন্যাসিকের এক নতুন দুঃসাহসিক অভিযান এবং এর অভাবনীয় সাফল্য তাঁর প্রতিভার অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস বিষবৃক্ষ। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর সুখদুঃখের চিত্র চিরন্তন মানব জীবনের একটি বিশিষ্ট দিকের চিত্র হলেও, ইহা প্রধানতঃ বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখের চিত্র বলে মনে হয়। 'রাধারানী' ও 'যুগলাঙ্গরীয়' উভয়েই প্রণয় কাহিনী এবং উভয়ক্ষেত্রেই প্রণয়ের পরিণতি মিলনে। প্রথম যুগের উপন্যাসের ন্যায় 'যুগলাঙ্গুরীয়'তে বঙ্কিমচন্দ্র অতীতের প্রতিবেশ রচনা করেছেন। হিরন্ময়ী প্রাচীন তাম্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠ কন্যা। পক্ষান্তরে রাধারানী' বিষবৃক্ষের মত সমসাময়িক যুগের কাহিনী, গল্পের নায়িকা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত স্বাধীনচেতা নারী। শিক্ষা ও প্রতিবেশের তারতম্যের ফলে হিরন্ময়ী ও রাধারানীর মতো স্বভাবতঃই চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। উভয়েই প্রেমিকা কিন্তু হিরন্ময়ীর পিতা যখন তার বিয়ের উদ্যোগ করল, তখন সে অবস্থায় বিয়ে তার পক্ষে মৃত্যুতুল্য হলেও হিরন্ময়ীর মুখ ফুটে কোনরূপ প্রতিবাদ বা আপত্তি করতে পারল না। উভয় উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গি অতীতের দৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ আধুনিক বলে মনে হয়।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যবহার করেছেন। বিষবৃক্ষ ও ইন্দারা'র মতো এই উপন্যাসেও মূল কাহিনী গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী, এর সমস্যা গার্হস্থ্যজীবনের সমস্যা। রজনী' বাংলা সাহিত্যে নতুন শ্রেণীর উপন্যাস। রজনী'তে কোন একটি চরিত্র একমাত্র বক্তা নহেন। উপন্যাসের প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্র আখ্যারিকার কোন না কোন অংশ বর্ণনা করেছেন এবং তাদের পরস্পর বর্ণনার সংযোজনায় সমগ্র কাহিনীটি রূপায়িত হয়েছে। কৃষ্ণকান্ডের উইল' বিষবৃক্ষের মতো খাঁটি পারিবারিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু হল এই রকম গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের জীবনের ট্র্যাজেডি শাশ্বত মানব জীবনের ট্র্যাজেডি হলেও বাঙালি জীবনের বাস্তব ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। হরলালের বিধবা-বিবাহের হুমকি, রোহিনী কর্তৃক উইল চুরির সংবাদে চাকরানী মহলে চাঞ্চল্য, কৃষ্ণকান্তের কাছারিবাড়ি ও রোহিনীর বিচারপর্ব, বারুনীর ঘাটে পল্লীরমনীগণের জটলা ও কুৎসাপ্রচারে তাদের উৎকন্ট আনন্দ, কৃষ্ণকান্তের শ্রদ্ধানুষ্ঠান, হরিদ্রগ্রামের

পোষ্ট অফিস, এ সমস্তই সেকালের বাস্তব সমাজচিত্রের পরিচয় বহন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রাজসিংহ' তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, স্থূল ঘটনা অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল ইতিহাসে যেমন আছে প্রায় তেমনই বলেছেন কোন যুদ্ধ বা তার ফল কল্পনাপ্রসূত নয়, যুদ্ধের প্রকরণ যা ইতিহাসে নাই তা গড়ে দিতে হয়েছে। ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদিপুরী, এঁরা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। এঁদের চরিত্র ইতিহাসে যেরূপ আছে, তেমনই রাখা হয়েছে। তবে তাঁদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখত হয়েছে তার সবটাই ঐতিহাসিক নয়।

আনন্দমঠে'র আখ্যানভাগ বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের দুটি স্মরণীয় ঘটনা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং তা মন্বন্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। একদিকে রাজশক্তির অক্ষমতা ও অব্যবস্থা, অন্যদিকে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ এই উভয় কারণে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল তাই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদে এই বিশৃঙ্খলতার নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর মতো 'দেবী চৌধুরীনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যায়িকার পশ্চাতে একটি ঐতিহাসিক পটভূমি জুড়ে দিয়েছেন। ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই দেশের সর্বত্র অরাজকতার রাজত্ব, দেশব্যাপী অরাজকতার সুযোগ নিয়ে ডাকাতি ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল। এবং মন্বঃন্তরের ফলে গ্রাম্য চাষীরাও ডাকাতের দলে যোগ দিতে লাগল। ভবানী পাঠক অবাঙালি হলেও বাঙালির মধ্যেও ডাকাতের সর্দারের ভূমিকা নিয়েছে। একদিকে এই সকল পেশাদার ডাকাতের বেআইনী কার্যকলাপ, অন্যদিকে ইজারাদার দেবী সিংহের আইনের আশ্রয়ে অত্যাচার—উপন্যাসে বর্ণিত দেবী চৌধুরানীর জীবন কাহিনী বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এই দুই ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। অবস্থা বিপর্যয়ে আশ্রয়হীন গৃহস্থ্যকন্যা প্রফুল্ল ডাকাতের সর্দার ভবানী পাঠকের আশ্রয় লাভ করে দেবী চৌধুরানীতে রূপান্তরিত হল, আবার দেবী সিংহের অত্যাচারে সর্বহারা শ্বশুরকে রক্ষা করতে গিয়ে দেবী চৌধুরানী সরল এবং পুরাতন প্রফুল্ল নতুন রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করল। 'আনন্দমঠে'র মতো দেবী চৌধুরানীতে বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যায়িকার মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রচার করেছেন। আনন্দমঠে'র সত্যানন্দ সন্ন্যাসী, জীবানন্দ ও শান্তি গৃহী হয়েও গৃহাশ্রমের বাইরে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে গৃহাশ্রমই নিস্কাম সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্র এবং তার আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। আলোচ্য উপন্যাসে প্রফুল্লচরিত্রে গৃহাশ্রমে নিস্কাম সাধনার চরম উৎকর্ষের রূপায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরিশেষে বলা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই উপন্যাসের শিল্পসমৃদ্ধ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনি প্রথমে ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ করলেও তার প্রত্যেকটি উপন্যাস মৌলিক কল্পনা ও রচনাগুনেই সমৃদ্ধ।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, শুদ্ধসত্ব, বাংলা সাহিত্যের নানারূপ, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ১৬১
২. ভট্টাচার্য, দেবীপদ, উপন্যাসের ধারা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১২০
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৭৫
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৭১

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বাংলা সাহিত্যে নানারূপ, শুদ্ধসত্ব বসু, বিশ্বাস বুক স্টল, কলিকাতা-৭০০০০৯
২. উপন্যাসের ধারা, দেবীপদ ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭০০০৭৩
৩. বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০০৭৩
৪. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ক্ষেত্রগুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, কলিকাতা-৭০০০০০৯
৫. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০০৭৩
৬. উপন্যাসের বর্ণমালা—সুমিতা চক্রবর্ত্তী, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০০৯
৭. উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, শ্রী প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলিকাতা-৭০০০০০৯
৮. বঙ্কিম উপন্যাসের মূলরূপ ও রূপান্তরে, ড. অপর্ণা ভট্টাচার্য, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা-৭০০০০৭৩